# শোল মাছ চাষ পদ্ধতি

প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা জাতের মাছ স্বাভাবিক সহাবস্থানে বেড়ে ওঠে, কেউ অন্য মাছ খায় আর কেউবা খাদ্য হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেও টিকে থাকে। নানা জাতের দেশীয় ছোট মাছ সহজে প্রচুর সংখ্যক পোনা ছাড়ায় এগুলি রাক্ষুসে হিসেবে পরিচিত দেশী মাছগুলির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হবার পরেও পরিবেশে টিকে থাকে। কিন্তু অধিক লাভের আশায় এক সময় রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের নামে সব ধরণের মাছ বিষ প্রয়োগে নিধন করা হতো। কিন্তু এসব মাছের পুষ্টিমান, চাহিদা ও বাজারমূল্য বিবেচনায় এখন লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিশ্রচাষে নানা জাতের ছোটমাছ এমনকি রাক্ষুসে মাছও চাষ করা লাভজনক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রসঙ্গত রাক্ষুসে মাছ হিসেবে পরিচিত শোল মাছকেও রুই জাতীয় মাছ চাষের জন্য পুকুর হতে অপসারণ করতে বলা হতো। ফলে পুকুরের পাশাপাশি চাষের আওতাধীন বিল-জলাশয় হতেও শোলসহ অন্যান্য রাক্ষুসে মাছ অপসারণ করা হতো। যার ফলে কালক্রমে সব জলাশয়ে শোল মাছের পর্যাপ্ততা কমে গেছে এবং বাজারে শোল মাছের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। শোল মাছ এখন বাজারের দামি মাছের মধ্যে অন্যতম। প্রতি কেজি শোলের দাম চার শত টাকার কম নয়। অথচ শোল মাছ চাষ অত্যন্ত সহজ এবং এতে খরচও খুবই কম। শোল মাছ রোগ-ব্যাধিতে কমই আক্রান্ত হয়, তাছাড়া প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ মাছের সহনশীলতা অনেক বেশি। নানা প্রকার দুর্যোগ যেমন খরা, অতিবৃষ্টি, ঘোলাত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন কিংবা পিএইচের হ্রাস-বৃদ্ধিতেও টিকে থাকে । অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ থাকায় পানি ছাড়াও দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকে, ফলে অধিক দামে জীবিত মাছ বাজারজাত করা যায়, যা অন্য অনেক মাছের জন্য কঠিন।

**পুকুর প্রস্তুতিঃ** ছোট-বড় যে কোন পুকুরেই শোল মাছ চাষ করা যায়। পুকুরের পানি নিষ্কাষণ করতঃ তলা সমান করে কয়েকদিন রৌদ্রে শুকাতে হবে। এসময় পুকুরের পাড়ের ভাঙ্গা অংশ ও গর্তসমূহ ভালোভাবে মেরামত করতে হবে। পুকুরের চারদিকে অন্ততঃ ৫ ফুট উচ্চতায় জাল দিয়ে বেড়া দিতে হবে। অন্যথায় বর্ষাকালে শোল মাছ লাফিয়ে পুকুর থেকে বাইরে পালিয়ে যেতে পারে যার ফলে মোট উৎপাদন কমে যেয়ে আর্থিক মুনাফার স্থলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অতঃপর পুকুরের তলা ও পাড়ে শতাংশে ১ কেজি হারে চুন দিতে হবে এবং পানি প্রবেশ করিয়ে শতাংশে ১০০ গ্রাম হারে ইউরিয়া ও টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম হারে খৈল ও চালের মিহি কুড়া ও ১০০ গ্রাম চিটাগুড় ও ২ চা চামচ ঈস্ট সহযোগে ভালোভাবে অন্তত ত্রিগুন পানিতে মিশিয়ে রাখতে হবে এবং পরদিন মিশ্রণ হতে সংগৃহীত নির্যাস ছেঁকে নিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে করে মাছের জন্য দরকারী প্রাকৃতিক খাবারের উৎপাদন ভালো হবে।

**পোনা উৎপাদনঃ** হ্যাচারিতে শোল মাছের পোনা চাপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে উৎপাদন খুবই জটিল। অন্যদিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শোল মাছের পোনা উৎপাদন করা খুবই সহজ। শোল মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য পুকুরে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। পুকুরে এক বা একাধিক হাপা স্থাপন করতঃ চারদিকে ও উপরে নেট দিয়ে ঘিরে নিতে হয় অতঃপর কলমি লতা জাতীয় ভাসমান আগাছা, টোপাপানা বা সামান্য কচুরীপানা রাখা হলে এবং উপর হতে ছিদ্রযুক্ত পাইপ দিয়ে ঝর্ণা আকারে পানি ফেলতে থাকলে প্রাকৃতিক পরিবেশজনিত আবহ তৈরি হয় যা এ মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। তাছাড়া কিছুটা ভাসমান আগাছা পূর্ণ পরিবেশ শোল মাছ চাষের জন্যও ভালো। কারণ শোল মাছ আড়ালে আবডালে ও কিছুটা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কচুরীপানায় যেন সমস্ত পুকুর ভরে না যায়। এধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে শোল মাছের পোনা উৎপাদন করা খুবই সহজ। উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে ভিন্ন ভিন্ন উৎসের প্রজননক্ষম ১টি পুরুষ ও ০১টি স্ত্রী শোল মাছ একেকটি হাপা বা ছোট বদ্ধ জলাশয়ে রাখতে পারলে সেখানেই তারা পোনা ছাড়ে। আর এ সুবিধার জন্য হ্যাচারী ছাড়াই ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকে শোল মাছের পোনা উৎপাদন করছেন। মা শোল মাছই নিজেদের মতো করে ডিম নার্সিং ও পোনা লালন করে। পোনাকে শত্রু মাছের কবল থেকে বাঁচাতে নিজেরাই পাহাড়া দেয়।

**পোনা সংগ্রহঃ** বাংলাদেশে বানিজ্যিক ভাবে শোল মাছের চাষ খুব বেশি সম্প্রসারিত না হলেও অনেক অগ্রসর চাষি এগিয়ে এসেছেন, চাষ লাভজনক হওয়ায় তারা নিজেরাই শোল মাছের পোনা উৎপাদন করে চাষ করছেন। তবে পোনা উৎপাদন করা সম্ভব না হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেও পোনা সংগ্রহ করা যায়। সাধারণতঃ মে মাসের দিকে বা বর্ষার শুরুতেই অগভীর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রচুর পোনার ঝাঁক পাওয়া যায়। তাই নিজে পোনা উৎপাদন করতে না পারলে এ সময় প্রাকৃতিক উৎস্য হতে পোনা সংগ্রহের উপর জোর দিতে হবে। পোনা সংগ্রহের জন্য মনে রাখতে হবে বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাস শোল মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম। বৈশাখ মাসের প্রথম থেকে শোল মাছ বাচ্চা দিতে শুরু করে। বাচ্চাগুলো এক ঝাঁকে থাকে। কাজেই সেই সময় হাওড়-বাওড়, পুকুর থেকে সপ্তাহ খানেক বয়সের বাচ্চা সংগ্রহ

করা যায়। আবার ছোট পোনা না পেলেও বাজারে যে ছোটো শোলমাছ পাওয়া যায় তা পোনা হিসেবে সংগ্রহ করে মজুদ করা যেতে পারে।

**পোনা মজুদঃ** উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পর একই আকৃতির বা একই ব্যাচে জন্ম নেয়া শোল মাছের পোনা একসাথে মজুদ করতে হবে যাতে করে বড় মাছের দ্বারা ছোট মাছ আক্রান্ত না হয়। পোনা বিভিন্ন উৎস্য হতে সংগৃহীত হলে একই আকৃতির পোনাগুলি একটি পুকুরে মজুদ করতে হবে। একক চাষে প্রতি শতাংশে ১০টি পোনা দেয়া যেতে পারে, আর মিশ্র পদ্ধতিতে চাষের জন্য প্রতি শতাংশে ৪টি পোনা ছাড়া যায় । নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ, প্রয়োজনে পানি পরিবর্তন ও পুকুরের পরিবেশের প্রতি নিয়মিত যত্নশীল থাকা সম্ভব হলে এর থেকেও বেশী পোনা মজুদ করে চাষ করা যেতে পারে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক শোল মাছ লম্বায় ২.৫-৩ ফিট হতে পারে।

| প্রজাতি | মডেল-১ (সংখ্যা/শতাংশ) | মডেল-২ (সংখ্যা/শতাংশ) | মডেল-৩ (সংখ্যা/শতাংশ) | মডেল-৪ (সংখ্যা/শতাংশ) | মডেল-৫ (সংখ্যা/শতাংশ |
|---|---|---|---|---|---|
| শোল | ১০ | ১৫-২০ | ২-৪ | ২-৪ | ৪-৬ |
| কাতলা | - | - | ১-২ | ২-৩ | ৫-৭ |
| রুই | - | - | ৩-৫ | ৮-১০ | ৮-১০ |
| শিং | - | - | ১৫-২০ | ১০-১৫ | ২০-৩০ |
| মলা | - | ৬০-৮০ | ৪০-৫০ | ৫০-৬০ | ৫০-৬০ |
| টেংরা | - | - | ৫০-৬০ | - | ১০-২০ |
| তেলাপিয়া | ২০ | ৫০-৮০ | - | ১০-১৫ | ২০-৩০ |

**খাদ্য ও খাদ্যাভাসঃ** শোল মাছ যেহেতু বানিজ্যিক ভাবে চাষ এই পর্যন্ত হয়নি তাই শোল মাছের খাদ্য নিয়ে বিস্তর গবেষনা হয়নি। কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে শোল মাছ সাধারনত খৈল বা কুড়া দিয়ে বানানো খাবার খায় না। বরং ছোট জীবিত মাছই এর প্রধান খাদ্য। ব্রুড শোল মাছ মজুদের পর খাদ্য হিসেবে কার্প জাতীয় মাছের ধানী পোনাও খেতে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া ছোট ছোট ব্যাঙ বা ব্যাঙাচি দেয়া যেতে পারে। ছোট ব্যাঙ অনেক সময় লাফিয়ে চলে যেতে পারে। সে জন্য ব্যাঙগুলোকে আধমরা করে দিতে হবে। ব্যাঙাচি দিলে আধমরা করার কোন প্রয়োজন নেই। ব্রুড শোল মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যাঙাচির তুলনা হয় না, তবে সহজপ্রাপ্য যেকোনো ছোট মাছও দেয়া যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম থেকে শোল মাছ বাচ্চা দিতে শুরু করে। বাচ্চাগুলো এক ঝাঁকে থাকে। সপ্তাহখানেক বয়সের হলেই ঠেলা জাল দিয়ে পোনার ঝাঁক ধরে সিস্টার্ণ বা চৌবাচ্চ বা হাউজে নিয়ে যেতে হবে। পোনাগুলি খাদ্য হিসেবে প্রথম ১/২ দিন কিছুই খেতে চায় না। পোনার প্রথম খাবার হিসেবে হাঁসের ডিম ভেঙ্গে তা বাটি বা গামলায় রেখে ফাটিয়ে নিয়ে চামচ দিয়ে পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ২/৩ দিনেই খাবারে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। তারপর পাউডার জাতীয় নার্সারী ফিড বা ফিসমিল অথবা চিংড়ির শুটকি ভালভাবে পিষিয়ে গুঁড়া করে দিতে হবে। তাছাড়া যেকোনো মাছ সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে ও কাটা ছাড়িয়ে প্রথমে গুড়ো করে ছিটিয়ে দিতে হবে। একটু বড় হলে সিদ্ধ মাছ হতে ছাড়ানো মাছ বা লাল পিঁপড়ের ডিম, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম বা ক্রাম্বল সাইজ নার্সারী ফিড দিতে হবে। এভাবে ১৫ দিন খাওয়ানোর পর পোনাগুলো প্রায় ২/৩ ইঞ্চি সাইজ হয়। এরপর পোনাগুলোকে চাষের জন্য অবমুক্ত করতে হবে।

শোল মাছের প্রিয় জীবিত খাদ্য, শুরুতে ময়না জাতীয় জুওপ্লাংকটন ও পরে ছোট চিংড়ি বা কানপোনা/ডানকানা জাতীয় ছোট মাছ খাওয়ানো যায়। আরো বড় হলে তেলাপিয়ার পোনা বা ছোট কার্প জাতীয় মাছের পোনা জীবিত খাদ্য হিসাবে দেয়া যায়। শোল মাছ মরা টাটকা মাছও খায়। তবে ব্যপক বাণিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে কৈ, শিং, মাগুরের জন্য প্রস্তুত করা উচ্চ মানের আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিতে থাকলে তাতে অভ্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ রাক্ষুসে মাছ জীবিত মাছ খেতে পছন্দ করলেও তারা সবধরণের খাবারে অভ্যস্ত হতে পারে। আর রেডি ফিডে থাকা ফিসমিলের ঘ্রাণ পেলে শোল মাছ খাবে বলে আশা করা যায়। তৈরি খাদ্যে অভ্যস্ত করার জন্য ছোট থাকতেই খাদ্য প্রয়োগকালে আস্তে আস্তে ও অল্প অল্প করে খেতে দেয়া এবং বেশ সময় নিয়ে খাওয়ানো দরকার। তবে আমাদের দেশের প্রান্তিক চাষীদের সামর্থ্যের বাস্তবতায় জীবিত খাদ্য চাহিদা সহজতর করতে তেলাপিয়া বা কার্পের সাথে শোল মাছের মিশ্রচাষ করা যেতে পারে। প্রান্তিক চাষিগণ শোল মাছের খাদ্য রুপান্তর হার ২.২২ পেয়েছেন অর্থাৎ প্রতি কেজি মাছ উৎপাদনের জন্য ২কেজি ২২০ গ্রাম খাবার খাওয়াতে হয়েছে।

**উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ঃ** এ দেশের অগ্রগামী শোল মাছ চাষীরা স্বল্প পরিসরে চাষে ৬ মাসে এক একটি শোল মাছের ওজন ৭০০ গ্রাম হতে ১০০০ গ্রামের মধ্যে পেয়েছেন এবং মাত্র ০১ কাঠায় (১.৬৫ শতাংশ) প্রায় ৫০০০টি পোনা ছেড়ে ৪ মাসে ১০০০ কেজি ২০০ গ্রাম আকারের শোল মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন, যা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক।

কেননা, শোল মাছের একক চাষে প্রতি শতাংশে ১০টি হারে ছাড়া মাছের ৯০% বেঁচে থাকলে এবং প্রতিটি মাছ গড়ে ৭০০ গ্রাম হলে প্রতি একরে বেঁচে থাকা ৯০০ মাছের উৎপাদন দাঁড়ায় ৯০০*৭০০গ্রাম বা ৬৩০কেজি, বছরে উৎপাদন ৬৩০*২ বা ১২৬০কেজি, পাইকারী মূল্য ৩৫০টাকা কেজি দরে যার বাজারমূল্য ৪লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। পরিকল্পিত বাণিজ্যিক চাষে এয়ারেশন, মাঝে-মধ্যে পানি পরিবর্তন ও পানির গুনাগুণ ঠিক রাখতে পারলে আরো অধিক ঘনত্বে মজুদ করে এ মাছের উৎপাদন অনেক বেশি বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া স্বল্পমূল্যে পাওয়া ছোট মাছ খাওয়ানোর কারণে খাদ্য বাবদ ব্যয় খুব বেশি হয় না। কারণ প্রতি কেজি মাছ উৎপাদনের জন্য দরকারী ২.২ কেজি তেলাপিয়া, পুঁটি ইত্যাদি জাতীয় ছোট মাছের দাম এলাকা ভেদে সর্বোচ্চ ১২০-১৫০টাকা। অন্যান্য খরচসহ প্রতি কেজি মাছ উৎপাদনে ব্যয় ২০০-২৫০ টাকার অধিক নয়। কেজি প্রতি ১০০টাকা লাভ হলেও একর প্রতি নীট আয় সোয়া লক্ষ টাকার বেশি। আহরিত মাছ সহজে মরে না, জীবিত বিক্রয় করা যায়, ফলে এ মাছ জিইয়ে রেখে ভালো দামে বিক্রয় করা সহজ হয়।

**রোগঃ** শীতকালে শোল মাছে ক্ষত রোগ দেখা দেয় তাই সে সময় মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে সাধারণতঃ শীতের শুরুতে (আশ্বিন মাসের শেষে কিংবা কার্তিক মাসের প্রথম দিকে) শতাংশে ১ কেজি হারে চুন ও ১ কেজি হারে লবন প্রয়োগ করলে আসন্ন শীত মৌসুমে ক্ষত রোগ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। এরপরেও ক্ষত রোগ হলে আক্রান্ত মাছ আলাদা করে ১০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম লবণ গুলে লবণ-মিশ্রিত পানিতে রোগাক্রান্ত মাছ পাঁচ থেকে দশ মিনিট ডুবিয়ে রেখে আবার পুকুরে স্থাপিত হাপায় ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে সকাল বিকাল ৫-৭ দিন চিকিৎসা করালে আক্রান্ত মাছ সুস্থ হয়ে যায়।

দেশের সব ধরণের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হারাতে বসা মাছের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সবার এগিয়ে আসা উচিত। পোনা উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন ঠেকাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস্ হতে ব্রুড সংগ্রহ করে কাজ করা উচিত। প্রাকৃতিক পরিবেশে যেভাবে নানা জাতের মাছ স্বাভাবিক সহাবস্থানে বেড়ে ওঠে ঠিক সেভাবেই পরিবেশবান্ধব চাষ হলে নানা বৈচিত্র্যতায় ভরা বাংলাদেশের স্বাদু পানির মাছগুলি টিকে থাকবে। বড় মাছের পাশাপশি দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাচুর্যতা বাড়লে দেশের আপামর জনগোষ্টির পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা সহজ হবে। তা না হলে, আগামী কয়েক বছর পরে দেশীয় নানা বৈচিত্র্যে ভরা মাছের অস্তিত্ব বিলীন হবে।